দৈনিক জনকণ্ঠ
The Daily Janakantha

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নতুন আতঙ্কের নাম বুলিং

প্রকাশিত: ১৭ - নভেম্বর, ২০১৯ ১২:০০ এ. এম.

- সৈয়দ ফারুক হোসেন

সম্প্রতি রাজধানীর একটি স্কুলের এক শিক্ষার্থী সহপাঠীদের উত্যক্তের শিকার হয়ে স্কুলভীতির সঙ্গে মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়েছে। অভিভাবকরা এর প্রতিকার চাইতে গেলে উল্টো স্কুল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে বুলিংয়ের শিকার হওয়া মেয়েটিকে। এ নিয়ে স্কুলের প্রিন্সিপাল ডিরেক্টরকে লিগ্যাল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ঘটনার শুরু ২০১৭ সাল থেকে। স্কুলটির সপ্তম শ্রেণীর একজন শিক্ষার্থী সহপাঠীদের বুলিংয়ের শিকার হয়। এরপর, ধীরে ধীরে সে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। ওই শিক্ষার্থীর স্কুলভীতি এবং মানসিক অবস্থার আরও অবনতি হলে আবারও তার অভিভাবক স্কুল কর্তৃপক্ষকে জানায় বিষয়টি। প্রতিকার না করে, উল্টো নির্যাতনের শিকার হওয়া মেয়েকে স্কুল থেকে বহিষ্কার করা হয়। নির্যাতনের শিকার হওয়া ওই শিক্ষার্থীর মা বলেন, 'আমি বিষয়টি বার বার স্কুল কর্তৃপক্ষের নজরে আনার চেষ্টা করেছি। কিন্তু তারা সেটিকে কোন গুরুত্ব দেয়নি। বরং তাদের আচরণে মনে হয়েছে তারা এ ধরনের অপরাধকে প্রশ্রয় দিয়েছে।' বিচার চেয়ে এবং সন্তানের শারীরিক ও মানসিক বিপর্যয়ের ক্ষতিপূরণ চেয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে উকিল নোটিস পাঠানো হয়েছে। স্কুল কর্তৃপক্ষ উপযুক্ত ব্যবস্থা না নিলে মামলা করার কথাও জানান তিনি।

সন্তানের শারীরিক ও মানসিক ক্ষতির জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষকে দায়ী করে ৮৫ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দাবি করেছেন মেয়েটির অভিভাবক। বুলিংয়ের কারণে শিশুদের মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হয়। তাই আমাদের দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বুলিং বিরোধী নীতি থাকা উচিত। না হলে ভবিষ্যতে বুলিংয়ের মতো ভয়াবহ ঘটনা ঘটবে। এ ছাড়া, যে সব শিক্ষার্থী বুলিংয়ের শিকার হচ্ছেন সেই শিশুদের কাউন্সিলিংয়ের আওতায় আনতে হবে। ইউনিসেফের এক গবেষণায় দেখা যায় শুধু বাংলাদেশে ৩৫ শতাংশ শিশু বুলিংয়ের শিকার হয় এবং অধিকাংশই মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এমন শিকার যেন আর কোন সন্তানকে না হতে হয়, এ জন্য আইনি নোটিস পাঠিয়েছেন শিক্ষার্থীর মা।

বুলিং আমাদের সমাজের অত্যন্ত ভয়াবহ একটি সমস্যা। এই সমস্যাটির সমাধান ও প্রতিকার না করা হলে, যুব সমাজ ও কিশোর-কিশোরীরা জীবনের একটি সুস্থ-সুশৃঙ্খল পথ থেকে সরে যাচ্ছে। জড়িয়ে যাচ্ছে নেশার সঙ্গে, কেউ আত্মহত্যা করছে, কেউ মানসিকভাবে আর স্বাভাবিক থাকতে পারছে না। নষ্ট হচ্ছে আমাদের সমাজ। তাই সমস্যা সমাধানের জন্য আমাদের সবার উচিত বুলিংয়ের শিকারদের বাঁচাতে এবং যারা বুলিং করে তাদের মানসিকতা বদলাতে পদক্ষেপ নেয়া।

কাউকে অপমান করা, আত্মসম্মানে আঘাত করা, দোষারোপ করা, হুমকি দেয়া, উত্যক্ত করা অথবা মানসিক ও শারীরিকভাবে অন্যদের দ্বারা আক্রমণ হওয়াকে বলা হয় বুলিং। এর আচরণগুলো মৌখিক আতঙ্ক, শারীরিক আক্রমণ বা জোরজবর আরও নানা ধরনের উত্যক্তমূলক আচরণের অন্তর্ভুক্তি হতে পারে। আমরা প্রায় সবাই বিভিন্ন সময়ে বুলিংয়ের শিকার হয়েছি। প্রাইমারী স্কুল থেকে কর্মস্থল সর্বত্রই বুলিংয়ের শিকার হতে হয়েছে বা হচ্ছে। সাধারণত খারাপ এবং নোংরা স্বভাবের ব্যক্তিরা নিরীহ, ভদ্র, ভাল মানুষ ধরনের মানুষের ওপর বুলিং করে। এক কথায় বলতে গেলে কাউকে মানসিক বা শারীরিকভাবে হেনস্তা করা। কাউকে অপমান, অপদস্থ করা, কারও সামনে কাউকে হেয় করা, এ রকম ব্যাপারগুলোই বুলিং। অনেক সময় আমরা কাউকে অপদস্থ করাটাকে মজা হিসেবে নিই, সেটাও বুলিং। বুলিং অন্যদের অশালীন ও অমানসিক আধিপত্য ব্যবহার। এই আচরণ প্রায়ই পুনরাবৃত্তি এবং অভ্যাসগত হয়। বুলিং এর চরম মাত্রায় অনেক সময় দলবদ্ধভাবে কারও ওপর চড়াও হওয়ার ঘটনাও ঘটে, সেটাকে বলে মবিং।

বুলিং অনেক ধরনের হতে পারে- শারীরিক, মৌখিক, সম্বন্ধযুক্ত, সাইবার-বুলিং, সমষ্টিগত, প্রতিবন্ধকতা, পারিবারিক ইভটিজিং, এ্যাডামটিজিং আরও নানা ধরনের।

বুলিং একজন মানুষকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে ফেলে। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে যখন ব্যাপারটা ঘটে, তখন তা বাচ্চাদের মানসিকতায় দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব ফেলে। অনেক সময় বুলিংয়ের শিকার কেউ কেউ সুইসাইডও করে ফেলে। বুলিংয়ের শিকার হয়ে মানুষ সামাজিক বা শারীরিক ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতা হারিয়ে ফেলে। এই ধরনের আধিপত্য, এই ধরনের আচরণের মাঝে সামাজিক শ্রেণী, জাতি, ধর্ম, লিঙ্গ, যৌন অভিযোজন, চেহারা, আচরণ, শরীরের ভাষা, ব্যক্তিত্ব, খ্যাতি, বংশ, শক্তি, আকার বা ক্ষমতা মানুষের ভিন্ন ধরন ও অন্যদের থেকে

পার্থক্যগুলো থেকে অন্তর্ভুক্ত হয়। বুলিং সমাজের একটি ভয়ঙ্কর ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। গবেষণায় দেখা যায়, বুলিংয়ের কারণে কিশোর-কিশোরীরা অনেকেই আত্মহত্যা করছে। এবিসি নিউজ, উইকিপিডিয়ার পরিসংখ্যান রিপোর্ট থেকে জানা গিয়েছে সারাবিশ্বে ৩০% ছাত্র-ছাত্রীরা বুলিংয়ের শিকার হয়ে তারা স্কুলে যাচ্ছে না, তাদের মধ্যে অনেক ভয়ভীতি ও বিষণœতা কাজ করে। ১৩-২৩ বছর যুবক-যুবতীরা আত্মহত্যার ওপর বেশি প্রলোভিত থাকে। বুলিং তাদের জীবনে অনেক বাজে প্রভাব ফেলছে। তারা জীবন থেকে অনেক পিছিয়ে পড়ছে অথবা অনেকে নিজের জীবন ত্যাগ করে দিচ্ছে। মা-বাবা হারাচ্ছে তাদের আদরের সন্তান। জীবন থেমে যাচ্ছে এই কিশোর বয়সেই। বুলিংয়ের সমস্যাটি বাংলাদেশসহ এশিয়াতে দিনে দিনে বেড়েই চলছে। বুলিংয়ের শিকার তারাই হয়ে থাকে যারা সাধারণত অন্যদের থেকে একটু ব্যতিক্রম হয়ে থাকে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, পরিবারে, কর্মস্থলে বা অন্য কোথাও যখনই কেউ বুলিংয়ের শিকার হবে, শুরু থেকেই সেটার প্রতিবাদ করতে হবে, না হলে এটি ক্রমশ বাড়তেই থাকবে। বাবা-মায়েদের তাদের সন্তানের সঙ্গে অনেক বন্ধুত্বসুলভ আচরণ করতে হবে এবং তাদের প্রতিদিনের খোঁজখবর নিতে হবে। সন্তানের দিনটি কেমন ছিল সেটা জানতে হবে আর সেই অনুযায়ী পরামর্শ দিতে হবে। বাবা-মায়ের স্কুলের শিক্ষকগণদের সঙ্গে সব-সময় যোগাযোগ রাখতে হবে, সন্তানের সব ধরনের খোঁজ খবর নেয়া এবং খোলাখুলি আলোচনা করতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বুলিংয়ের বিরুদ্ধে কড়াকড়ি ব্যবস্থা থাকতে হবে। শিক্ষকদের বুলিংয়ের ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে এটার প্রভাব ও প্রতিকার নিয়ে আলোচনা করতে হবে। মিডিয়া যেমন- রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্র- এসবে বুলিং প্রতিরোধের বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করতে হবে।

সভ্য এবং উন্নত দেশগুলো বুলিংয়ের ব্যাপারে এখন বেশ সোচ্চার। তারা বুলিং প্রতিরোধে বিভিন্ন রকমের সচেতনামূলক কার্যক্রম করে থাকে। আবার কোথাও কোথাও বুলিং প্রতিরোধে আইনও রয়েছে।

সাইবার বুলিংয়ের ঘটনা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে ঘটলেও ফোনে কিংবা ইমেইলেও অনেক সময় এ ধরনের নির্যাতনের ঘটনা ঘটে থাকে। বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের মাধ্যমে অশ্লীল ও হুমকিমূলক বার্তা পাঠানো হয়। এ ছাড়া ইন্টারনেট চ্যাটরমে থাকা অন্যান্য ইউজারকে নিয়ে ঠাট্টা-মশকরা কিংবা মানহানিকর ছবি আপলোড করা তো স্বাভাবিক কাজে পরিণত হয়েছে। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ব্যাপার হলো কারো ব্যক্তিগত তথ্য কিংবা তার চরিত্র নিয়ে মিথ্যা ও মানহানিকর তথ্য অনলাইনে শেয়ার করা। আর নেতিবাচক এই উপস্থাপনের কারণে আক্রান্ত ব্যক্তিকে সামাজিকভাবে হেয় হতে হয়। যদিও আগে এই বিষয়টি শুধু শিশু-কিশোরদের ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হতো, কিন্তু নারীরাও এখন সাইবার ক্রিমিনালদের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। সেই সঙ্গে অনেক তারকা ও সাধারণ মানুষও এর শিকার হচ্ছে।

সাইবার বুলিংয়ের শিকার হলে সবার আগে পরিবারকে জানাতে হবে। যদি পরিবারের কাউকে বলতে ভয় লাগে বা পরিবারের লোকজন দূরে থাকে তাহলে কাছের কোন বন্ধু বা অভিভাবক শ্রেণীর কাউকে জানানো উচিত। শিশু-কিশোর ও তরুণীরা সাইবার বুলিংয়ের সবচেয়ে বেশি শিকার হয়। তাই বাবা-মায়ের উচিত সাইবার বুলিং কী, অপরিচিত বা অনলাইন বন্ধুরা কেন অনিরাপদ এবং তাদের সঙ্গে কেন ব্যক্তিগত কিছু শেয়ার করা যাবে না ইত্যাদি বিষয়গুলো সন্তানকে বুঝিয়ে বলা। সচেতনতায় অনলাইনে আরও যেসব আচরণবিধি মেনে চলা উচিত তা হলো-ফেইসবুক, ইমেইল ও অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়া আইডির পাসওয়ার্ড কখনো কাউকে জানানো যাবে না। গায়ে পড়ে কেউ খাতির জমাতে চাইলে অযথা কথা না বাড়িয়ে ব্লক করে রাখাই উত্তম। অনলাইন আইডি নিরাপদ রাখতে কঠিন পাসওয়ার্ডের ব্যবহার করা। অপরিচিত নম্বর থেকে আসা কল রিসিভ করা থেকে বিরত থাকা, কেউ এসএমএস করে পরিচয় জানিয়ে কল দিলে কথা বলা উত্তম। সাইবার বুলিং থেকে নিরাপদ থাকতে প্রথমত ব্যক্তি ও সামাজিক জীবন পৃথক রাখাই বুদ্ধিমানের পরিচয়। যেমন নিজের ঠিকানা, কলেজ, ফোন নম্বর ইত্যাদি কখনই প্রকাশ করা উচিত নয়। যে কাউকে অনলাইন ফ্রেন্ড বানানো থেকে বিরত থাকা ও পোস্টের প্রাইভেসি ফ্রেন্ডস রাখা। ফেসবুক বা অন্য কোন ওয়েবসাইটে ছবি আপলোড করার আগে জেনে রাখা এটি যে কেউ নামিয়ে এডিট করতে পারে। কেউ ফোনে বিরক্ত করলে তাৎক্ষণিকভাবে বিষয়টি পরিবারকে জানিয়ে দেয়া এসএমএস পাঠিয়ে বা কেউ অনলাইনে বিরক্ত করলে স্ক্রিনশট রেখে দেয়া এর পরেও কেউ বিরক্ত করার চেষ্টা করলে আইনী সহায়তা নেয়া উচিত।

বুলিংয়ের কারণ যথাযথভাবে নির্ণয় করতে পারলে তা বুলিং এর মাত্রা কমাতে সাহায্য করবে। একজন বুলিং সাধারণত রাগ, ক্ষোভ এবং অল্পবিস্তর ডিপ্রেশনের শিকার হয়ে থাকেন। কাউন্সেলিংয়ের মাধ্যমে তার চিন্তাধারা সম্পর্কে ধারণা নিয়ে তাকে বুলিংয়ের ক্ষতিকর দিকসমূহ সম্পর্কে বোঝানো যেতে পারে। এ ছাড়া একজন বুলির মধ্যে নার্সিসিস্টিক পার্সোনালিটির কিছু লক্ষণও দেখা যায়। এক্ষেত্রে তাকে অন্যের মতামতকে গুরুত্ব দেয়া কিংবা অন্যের অসুবিধা বুঝতে পারা সম্পর্কে সাহায্য করা যেতে পারে। তার মধ্যে সিমপ্যাথি এমপ্যাথি ইত্যাদি গুণ গড়ে তুলতে সাহায্য করা যায়।

বুলিং সারাবিশ্বেই একটি সাধারণ ঘটনা হলেও ব্যক্তির মানসিক সুস্থতার ওপর এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব রয়েছে। আমাদের পাশের মানুষটিই হয়ত তার সোশ্যাল সার্কেল থেকে বিচ্ছিন্ন এই বুলিংয়ের কারণে; কিংবা সে নিজেই হয়ত একজন বুলি। বুলিংয়ের ভিক্টিম অথবা

এর জন্য দায়ীকে এটির নেতিবাচক দিকগুলো সম্পর্কে বুঝিয়ে বলা আমাদেরই দায়িত্ব। আমরা প্রায়শই দেখে থাকি ক্লাসের সবচেয়ে শক্তিশালী ছেলেটি হয়ত ক্লাসের সবচেয়ে দুর্বল ছেলেকে বুলিং করছে। এ ছাড়া অনেক সময় অবিসিটি কিংবা ইকোনমিক স্ট্যাটাসের কারণেও অনেকে বুলিংয়ের শিকার হয়ে থাকে। বিজ্ঞানীরা বুলিংয়ের কারণ হিসেবে হাই সেলফ এস্টিম, আগ্রাসী মনোভাব, ক্রোধ, বেড়ে ওঠার পরিবেশ ইত্যাদিকে দায়ী করেন। আমাদের বুলিংয়ের ব্যাপারে সচেতন এবং সোচ্চার হওয়া দরকার, যাতে নিজে বুলিংয়ের শিকার না হই এবং আমাদের সন্তানরাও বুলিংয়ের শিকার না হয়। যেখানেই বুলিং হবে সেখানেই প্রতিরোধ করতে হবে।

লেখক : ডেপুটি রেজিস্ট্রার, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

সম্পাদক, মুদ্রাকর ও প্রকাশক: মোহাম্মদ আতিকউল্লাহ খান মাসুদ (এম এ খান মাসুদ), উপদেষ্টা সম্পাদক: তোয়াব খান, নির্বাহী সম্পাদক: স্বদেশ রায়। সম্পাদক কতৃক গ্লোব জনকণ্ঠ শিল্প পরিবার-এর সদস্য প্রতিষ্ঠান যথাক্রমে গ্লোব প্রিন্টার্স লি: ও জনকণ্ঠ লি: থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। রেজি: নং ডিএ ৭৯৬। কার্যালয়: জনকণ্ঠ ভবন, ২৪/এ রাশেদ খান মেনন সড়ক, নিউ ইস্কাটন, জিপিও বাক্স: ৩৩৮০, ঢাকা, ফোন: ৯৩৪৭৭৮০-৯৯ (অটোহান্টিং ২০ টি লাইন), ফ্যাক্স: ৯৩৫১৩১৭, ৮৩১৬৩৩৫, ই-মেইল: janakanthanews@gmail.com ওয়েবসাইট: www.dailyjanakantha.com এবং www.edailyjanakantha.com ।। Copyright ® All rights reserved by dailyjanakantha.com

Developed By Bikiran.Com